জিন বেগুন—আপনার থালায় নতুন খাবার

অংশুমান দাশ

বেগুনকে আমরা কে বা পাত্তা দিয়েছি। নামেই কেমন যেন একটা অশ্রদ্ধার ভাব, বে-গুণ। কেবল লুচি, খিচুড়ি আর ইলিশের সময় বেগুনের কথা মনে পড়ত আমাদের। সেই সামান্য নিরামিষ বেগুন যে দেশ জুড়ে এরকম উত্তেজক তর্ক-বিতর্কের খোরাক হয়ে উঠবে কে জানত। অবশ্য এ যে সে বেগুন নয় —একেবারে জিন বদলানো বেগুন।

জিনপরি নয়, জিন

উদ্ভিদ-প্রাণীর শরীরে জিন-ই সবকিছু ঠিক করে। মানে সে দেখতে কেমন হবে, কত বড় হবে, গায়ের রং ফরসা হবে না কালো, স্বাদ হবে মিষ্টি না টক— এইসব আর কি। একজনের জিন যদি অন্যজনের জিনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে, একজনের চরিত্রের সঙ্গে অন্যজনের চরিত্রও যাবে মিশে। যেমন আমের স্বাদ হল কাঁঠালের মতো অথচ গন্ধ লেবুর মতো। সে কী! কী সর্বনাশ—এতো বকচ্ছপ, হাতিমি অথবা জিরাফড়িং এর দশা—অবশ্য এখনই এতটা আনন্দিত অথবা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি। তবে ব্যাকটেরিয়ার জিনের কিছু অংশ গাছের জিনে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, যেমন কিনা আমাদের বেগুন।

ব্যসিলাস থুরিনজিয়েনসিস এরকম এক উপকারী ব্যাকটেরিয়া (ছোট নাম BT), যার দ্রবণ ফসলে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা এই ব্যাকটেরিয়ার জিন নানা বৈজ্ঞানিক কারিকুরির মাধ্যমে বসিয়ে দিলেন গাছের জিনে। যাতে গোটা গাছটা নিজেই ওই BT-র মতো বিষ উৎপাদন করতে পারবে। ভারতবর্ষে এই BT প্রযুক্তির তুলো চাষ হয়েছে ব্যাপকভাবে। এখন পালা বেগুনের। তুলো, বেগুন ছাড়া সয়াবিন, ভুট্টা এইসব জিন ফসলেরও চাষ হয় পৃথিবীর কিছু দেশে। তবে বেগুনই প্রথম মানুষের খাদ্যযোগ্য ফসল। এতদিন পর্যন্ত সবই ছিল পশুখাদ্য। সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষই প্রথম দেশ, যারা অন্তত প্রাথমিকভাবে কোনো খাদ্যযোগ্য জিন ফসলের (Genetically Modified বা জিএম) বাণিজ্যিক চাষে সম্মতি দিয়েছে।

কেন বেগুন

ভারতবর্ষে সব থেকে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য সবজি বেগুন। পশ্চিমবঙ্গ সম্ভবত বেগুন ফলনে সব থেকে এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে ১.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২৭ লক্ষ টন বেগুন উৎপাদিত হয়। বিশেষত শীতের সময় বাজার আলো করে সাদা-সবুজ-কালো-বেগুনি নানা রঙের গোল-লম্বা-ছোট-বড় নানা মাপের বেগুন। আর বেগুন কিনতে গিয়ে সবাই চিন্তিত —পোকা নেই তো? বেগুনের পোকা আসলে খুব সাধারণ রোগ। প্রতি বছর হাজার হাজার টন বেগুন নষ্ট হয় নানা ধরনের রোগে। হিসেব মতো বেগুনের প্রায় ১৪-১৫ রকম পোকা আছে। তার মধ্যে দু ধরনের ফল ও ডগাছিদ্রকারী পোকা Leucinodes orbonalis এবং Helicoverpa armigera সব থেকে ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়। দুটি ক্ষেত্রেই BT কীটনাশক কার্যকারী। কিন্তু বেগুন গাছ নিজেই যদি BT-র মতো বিষ উৎপাদন করতে পারে, তবে লাভ অনেকগুলো। এমনই ভেবেছেন বিজ্ঞানীরা। এই লাভগুলো হল, পোকা মারতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে না, বাঁচবে পরিবেশ, কমবে খরচ। বেগুনে পোকা না লাগলে, ফসলও নষ্ট হবে কম। চাষিদের লাভও বাড়বে আগের তুলনায়। সমগ্র পরিকল্পনার গবেষণা ও অর্থব্যয় মহারাষ্ট্র হাইব্রিড সিড কোম্পানির। যাকে সবাই চেনে মাহিকো বলে। মাহিকো আবার বহুজাতিক বীজ কোম্পানি মনসান্টোর অনুজপ্রতিম।

জিন বেগুনের ইতিহাস

২০০০ সালে এই প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর তড়িঘড়ি ২০০২ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে কৃষকের মাঠে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করায় মাহিকো। কিন্তু পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের অধীনস্থ Genetic Engineering Approval Committee (GEAC)-এর প্রথম বিশেষজ্ঞ কমিটি EC1 বলে মাহিকো ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো সংস্থার মাধ্যমে পরীক্ষার কথা। চাপানউতোর—কথাবার্তা চলে ২০০৯ অবধি। ১৬ সদস্যের দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি EC2 ২৯ মে ২০০৯ থেকে ১৪ অক্টোবর ২০০৯-এর মধ্যে (মাত্র) দুবার আলোচনায় বসে। তারা BT বেগুনের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার পক্ষে রায় দেয়। তখন বাকি ছিল কেবল সরকারি সম্মতির। গোল বাধল এর পরেই। এমনিতেই সারা পৃথিবী জুড়ে সাধারণ মানুষ, বিজ্ঞানীমহলের একাংশ এবং নানা সংগঠনের পক্ষ থেকে জিন-খাদ্যফসলের বিরুদ্ধে অস্থিরতা ছিলই। তবে বিতর্কে আরও ইন্ধন জোগালো বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান ড.রেড্ডি। তার কথায়— '...আমরা শুধুমাত্র যা তথ্য আমাদের দেওয়া হয়েছে তার উপরে পর্যালোচনা করেছি। পরীক্ষানিরীক্ষার উপরে আমাদের কোনো হাত ছিল না।' বিশেষজ্ঞ কমিটিতে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রতিনিধি ড. পুষ্প ভার্গব বিবৃতি দিলেন— '...বিশেষজ্ঞ কমিটি হয়তো কোনো চাপে ছিল...।'

দেশ জুড়ে আন্দোলন দানা বাঁধে। পক্ষের বিজ্ঞানীরা বলেন, এ তো বিজ্ঞান, সব রিপোর্ট রয়েছে, সব নির্ভুল, চাষিদেরও যখন ভালো হবে—তখন আর দেরি কীসের? বিপক্ষের বিজ্ঞানীরা বলেন যথেষ্ট পরীক্ষা হয়েছে কি? সওয়াল যখন মানুষের স্বাস্থ্যের তখন আরও সাবধান হতে হবে। একথা অবশ্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রীও। বিপক্ষের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি বলে—বিজ্ঞানের বাজারিকরণ হয়নি তো? যারা বেগুন ফলাবে আর বেগুন খাবে, তাদের কথা শোনার বুঝি দরকার নেই?

সবই যখন ভালো, তখন অসুবিধা কোথায়

সত্যিই তো, যদি ফলন বাড়ে, কীটনাশক ব্যবহার কমে, তবে BT বেগুনে ক্ষতি কী? আমরা বরং একটু খতিয়ে দেখি।

স্বাস্থ্য : যে চিন্তা পেস্টিসাইড নিয়ে, একই কথা এখানেও। যা পোকা মারছে, তা তো আমাদের ক্ষতি করবেই। পেস্টিসাইড তা ও খানিকটা

হলেও ধুয়ে ফেলা যায়, এখন তো BT-বিষ বেগুনের ভিতরেই। মাহিকো বলছে—ইঁদুর, গিনিপিগ, ছাগলের কিছু হয়নি। মানুষের হবেনা এমন কোনো গ্যারান্টি আছে? পোকাদের খাদ্যনালীতে ক্ষারত্ব বেশি। মানুষের শরীরও মূলত আম্লিক হলেও ডুওডেনামের পর ক্ষারত্ব দেখা যায়। BT-র বিষ ক্ষারের সংস্পর্শে অধিক ক্রিয়াশীল। তাহলে? ? মধ্যপ্রদেশে BT তুলোর গাছ খেয়ে ছাগল-ভেড়ার মৃত্যু পুরোনো স্মৃতি নয়।

অধিকার চাষের, খাদ্যের, বীজের : BT বেগুনের সঙ্গে সাধারণ বেগুনের চেহারায় কোনো তফাত থাকবে না। যদি আপনি BT বিষ -বেগুন না খেতে চান? যদি একজন চাষি BT চাষ না করতে চান, তবে কি সেই অধিকার থাকবে? কারণ পাশের খেতের BT বেগুনের পরাগরেণু ওই চাষির খেতের গাছে এসে মিলতেই পারে। তখন কি সেই চাষি ক্ষতিপূরণ পাবেন? ৫০-৬০ বছর ধরে যে বীজ সংরক্ষণ করে চাষ করছেন ভারতীয় চাষি—আজ হঠাৎ তাঁকে মাহিকোর এবং কেবল মাহিকোর বীজ ৫০,০০০ টাকা কিলো দরে কিনতে হবে প্রতি বছর?

বাজার—বাজার! : এই সব কিছু আসলে বাজারি চক্রান্ত নয় তো? বীজের ব্যবসা পৃথিবীর সব থেকে বড় ব্যবসা। ভারতবর্ষে কৃষিজ পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা দুই-ই বেশি। ভারতের বাজার মানে বিশাল মুনাফার অঙ্ক। ৬০-এর দশকে ধোঁকা দেওয়া সবুজ বিপ্লব, যার হাত ধরে হাইব্রিড চাষ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ভূগর্ভের জল তোলা, দেশজ বীজের সর্বনাশ আর মাটির উর্বরতার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি—সেই সবুজ বিপ্লবের মরীচিকা কিন্তু এই মনসান্টো-মাহিকো-কার্গিল বীজ কোম্পানিরই তৈরি। একসময় এরাই কীটনাশক বেচত। আজকে তারাই বলছে কীটনাশক খারাপ, বরং এমন বীজ দিচ্ছি যার মধ্যেই আছে বিষ। কেমন সন্দেহজনক লাগে। বহুজাতিক কোম্পানি কবে আর গরিবগুর্বোদের কথা ভেবেছে? প্রশ্নটা বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তি নিয়ে নয়। প্রশ্ন বিজ্ঞানের বাজারীকরণ নিয়ে, বিজ্ঞানের বিক্রি হয়ে যাওয়া নিয়ে। মাহিকোর টাকায় মাহিকোর BT বীজ মাহিকো-ধন্য বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করলে তার ফলাফল তো মাহিকো যেমন চায় তেমনই হবে।

বৈচিত্রময় বেগুন : সবুজ বিপ্লবের তাড়ায় ৩০,০০০ ধানের প্রজাতি খুইয়ে এখন ৩০০ তে এসে ঠেকেছে। ভারতবর্ষের ৩৫৬৮ রকমের বেগুনের জাত ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে BT-তাড়নায়। তার সঙ্গে যাবে বেগুনের হাজার রকম রান্না, বেগুনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ।

পরিবেশ : পেস্টিসাইড কমবে, তাই গরিব চাষিদের খরচ কমবে। কিন্তু BT তুলোর হিসেব বলছে অন্য কথা। BT তুলোর খেতে কীটনাশক বেড়েছে—কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যখন একটা-দুটো শত্রু পোকাকে তাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে, তখন অন্য শত্রুরা আরও চেগে উঠছে—তারাই হয়ে উঠছে প্রধান শত্রু। অতএব কীটনাশক, আরও কীটনাশক। অতএব খরচ কমার বদলে বাড়া। উপরন্তু প্রতিবছর চড়া দামে বীজ। অতএব আত্মহত্যা। অতএব ঋণ। তুলোর পরে এবার বেগুন—তারপর লাইনে আরও ৫৫টি ফসল। তার সঙ্গে হাড়িকাঠে আমাদের চাষ-বীজ-জলের সার্বভৌমত্ব, আর কী খাব কী চাষ করব তা বেছে নেওয়ার অধিকার।

অন্য বিপদ : বেগুনের পরাগমিলন সাধারণত পোকামাকড়ের দ্বারাই হয়। সুতরাং BT পরাগ অন্য জাতের বেগুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই জাতের সব বৈশিষ্ট্য বদলে দেবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া বেগুনের পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গাছ লংকা, টমেটো, আলুও যে পরাগমিলনের মাধ্যমে BT বিষে আক্রান্ত হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। একই পরিবারে আছে অন্তত ৪০টি আগাছা, যেগুলো বৃহতী, বেথুয়ার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি গাছ, তাদের কী হবে? অর্থাৎ আপনি বিষ খেতে না চাইলেও বিষ কোন্ রাস্তায় আপনার ভাতের থালায় এসে পড়বে, আপনি টেরও পাবেন না। বিজ্ঞানীরা বলছেন—BT বেগুনের খেত থেকে ৩০ মিটার দূরত্ব রাখলেই নাকি হবে। ভারতবর্ষে জমি থেকে জমির মধ্যে ৩০ মিটার ফাঁকা জায়গা শিশুর কল্পনাতেও আসবেনা। উপরন্তু পোকারা ৩০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে গিয়ে পরাগমিলন করতে পারে—কোন্ হিসেবে তা ৩০ মিটার?

সত্যিই কি দরকার আছে

সাতটি শহর ঘুরে পরিবেশমন্ত্রী মানুষের কাছে ফতোয়া পেয়েছেন আপাতত চলবেনা BT বেগুন। অতএব স্থগিতাদেশ। কিন্তু চটজলদ পালটা চাল—বায়োটেকনোলজি রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিল। যেখানে বলা হল, থাকবে এমন একটি কমিটি যে একাই বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত নিতে পারে কারোর সঙ্গে আলোচনা না করেই। বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে আপনার জেল-ও হতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশে এ কোন্ তালিবানি ফতোয়া? এরকম একটা সন্দেহজনক প্রযুক্তির জয়গান গাওয়ার জন্য কেন দেশে আসবে নতুন আইন?

মন্ত্রী মেনে নিয়েছেন এবং বিজ্ঞানীরাও, যে বিটি নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি। প্রকৃতি তো আর পরীক্ষাগারের মতো একটুকরো সরল পরিবেশ নয়—সুতরাং এইরকম একটা বিষ বীজ প্রকৃতিতে উন্মুক্ত করে দিলে তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল কী হবে তা নিয়ে কোনো ধারণা আমাদের নেই। সব থেকে জরুরি বিষয় আমাদের চাষিরা এখনও দেশি বেগুনের চাষই করেন, খুব বেশি হলে তার ১৫ শতাংশ হাইব্রিড। উৎপাদনও চাহিদার তুলনায় বেশি (পশ্চিমবঙ্গের উদ্বৃত্ত ৫৮ শতাংশ)। বেগুনের পোকা মারার সনাতন দেশজ অনেক পদ্ধতি আছে। এমন অনেক বেগুনের প্রজাতি আছে যাদের নিজস্ব ক্ষমতা আছে রোগ পোকা প্রতিরোধের। সর্বোপরি বেগুন চাষ যদি এতই অলাভদায়ক হবে, তবে এখনও চাষিরা চাষ করছেন কেন? বিদেশের বাজার, যারা জিনফসল কেনে না, তারা আমাদের জিন-দূষণের কবলে পড়া সবজি কিনবে তো? ভারতবর্ষে খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় হওয়ার আগেই বেগুন ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হত। ওষুধে বিষ মিশিয়ে আমরা ভুল করছি না তো?

এসবই প্রশ্ন এবং আশঙ্কা। উত্তর আসলে কোনো পক্ষের কাছেই খুব পরিষ্কার নয়। আবার প্রশ্ন, যদি পরিষ্কার নাই-ই থাকে তবে এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী? প্রকৃতির উপর খোদকারি না করে ২০০০ বছর ধরে যে কৃষিজ জ্ঞান আমরা সঞ্চয় করেছি তার উপরেই আস্থা রাখলে ভালো হত না? অবশ্য ব্রাত্যজনের বিজ্ঞানকে পুঁথি পড়া বিজ্ঞানীরা কবেই আর স্বীকৃতি দিয়েছেন! ■

ডি আর সি এস সি (প্রজেক্ট অফিস) ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৪২ থেকে প্রকাশিত ও জনস্বার্থে প্রচারিত